بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ২১ তবলীগ, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গতকাল ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি। এই দিনটি (আমাদের) জামা'তে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। এই দিনে বা এই প্রেক্ষিতে এর নিকটবর্তী দিনগুলোতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জামা'তগুলোতে সভাও হয়ে থাকে। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে একজন পুত্রের জন্ম এবং তার বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি আকারে তা প্রকাশিত হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই পুত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে ঐশী বাণীর একটি অংশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান হবেন। অতঃপর আরো বলা হয়েছে, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে (তাকে) পরিপূর্ণ করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা সে অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে একজন পুত্র দান করেন যিনি এই বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারকবাহক ছিলেন, যার নাম ছিল হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, যাকে মুসলেহ্ মওউদও বলা হয়। বড়োরা তো এটি জানেনই, যে শিশুরা জামা'তের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত তারাও এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত; আতফাল থেকে নিয়ে খোদ্দাম পর্যন্ত সব সংগঠনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল, সেই পুত্রকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে প্রখর মেধা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন জ্ঞানে পরিপূর্ণ করেছেন। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তার শিক্ষা হয়ত প্রাথমিক পর্যন্ত ছিল, বরং তা-ও ছিল না। হ্যাঁ, তিনি স্কুলে যেতেন; কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজেই লিখেছেন বা জানিয়েছেন, তিনি কখনো পরীক্ষায় পাশ করতেন না। পার্থিব পাঠ্য-বিষয়গুলোতে তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার দ্বারা এমন সব জ্ঞানগত, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কাজ করিয়েছেন যে, বড়ো বড়ো শিক্ষিতদেরও তার সামনে স্কুলের বালকের মতো মনে হয়, একেবারে শিশুর মতো মনে হয়; আর তার ৫২ বছরের খিলাফতকাল এর সরব সাক্ষী।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ধর্মের ও কুরআনের জ্ঞানের তো কোনো সীমাই ছিল না। তিনি পার্থিব বিষয়াদিতেও যেমন, দেশীয় রাজনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে অসাধারণ মানের রচনা লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। অর্থনৈতিক বিষয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন, সমাজতন্ত্রবাদ, কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ সম্পর্কেও তিনি বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতা করেছেন যা পরবর্তীতে পুস্তক আকারেও ছাপা হয়েছে। এটি জামা'তের সাহিত্যভুক্ত রয়েছে। এমনকি সামরিক বিষয়াদি ও সেনা সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন সব কথা তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ অবাক হয়ে যায়। অনেক বক্তৃতা তিনি বাইরের লোকদের সামনে দিয়েছেন আর তারা সেগুলোর গভীরতা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা না করে পারে নি। হাজার হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে এসব রচনা ও বক্তৃতা বিদ্যমান। সংক্ষিপ্ত

সময়ে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়, বরং শুধু পরিচতিও তুলে ধরা সম্ভব নয়। নমুনাস্বরূপ আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করব যেগুলো শুধু পরিচিতিমূলক।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নুতন বিশ্বব্যবস্থা, ইসলামে মতভেদের সূচনা– এই বিষয়গুলি এমন, যেগুলো প্রায়ই জামা'তে আলোচিত হয়। এগুলো ছাড়াও বহু রচনা যা সচরাচর মানুষের সামনে আসে না– সেগুলোর পরিচয় আমি উপস্থাপন করব।

তিনি 'তুরস্কের ভবিষ্যৎ এবং মুসলমানদের কর্তব্য' শিরোনামে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এর বিশ্লেষণ করেছিলেন। এটি ১৯১৯ সালের ঘটনা। অর্থাৎ তার খিলাফতের প্রারম্ভিক যুগের কথা। এর সারসংক্ষেপ বা পরিচিতি হলো, মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের প্রতিটি সুযোগ পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য হুযূর সেই সময়ে, যখন তুরস্কের সরকার হুমকির সম্মুখীন ছিল, অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত পথনির্দেশনা দিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সালে এই বই লিখেছিলেন। ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য তিনি এই পথনির্দেশক নীতি বর্ণনা করেছিলেন যে, আমার মতে এই জলসার ভিত্তি শুধু এটি হওয়া উচিত; [সেখানে তুরস্ক সরকারের পক্ষে একটি জলসা হবার কথা ছিল;] একটি মুসলিম সাম্রাজ্যকে সরিয়ে দেওয়া বা অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দেওয়া এমন একটি কাজ যা মুসলমান হিসেবে অভিহিত প্রতিটি ফির্কা অপছন্দ করে এবং এর কল্পনাও তাদেরকে কষ্ট দেয়। তারপর তিনি এটাও বলেছিলেন, তুর্কি সাম্রাজ্য এবং ইসলামের কেন্দ্র হিজায সম্পর্কে আমার পথনির্দেশনা এরূপ– আরবদের জাতিগত আত্মাভিমান ফুঁসে উঠছে এবং তারা স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। তেরোশ বছর পর এখন তারা পুনরায় নিজেদের চতুর্সীমার শাসক নিজেরা হয়েছে এবং নিজেদের সুশাসন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তারা যে স্বাধীনতার যোগ্য তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো নতুন প্রস্তাব সফল হতে পারে না, আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা গ্রহণও করতে পারে না।

তুরস্কের উন্নতির জন্য তিনি এই পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, শুধু জলসা-সমাবেশ এবং বক্তৃতায় কাজ হবে না, আর টাকা জমা করে বিজ্ঞাপন ও নিবন্ধ প্রকাশ করার মাধ্যমেও (তা হবে) না, বরং একটি নিয়মিত সংগ্রাম দ্বারা (তা হতে পারে) যা বিশ্বের সমস্ত দেশে এই কাজ সম্পাদনের জন্য করা উচিত। তিনি বলেন, এই যুগ হলো জ্ঞানের যুগ এবং মানুষ প্রতিটি বিষয়ের জন্য যুক্তি চায়। তাই এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত, সুসংগঠিত ব্যবস্থা থাকা উচিত; অর্থহীন কর্ম জ্ঞানীর কাজ নয়।

একই কথা আজও মুসলমানদের ভাবা উচিত। এটা তো শুধু তুর্কি সরকারের সাথে সম্পর্কিত ছিল সেই সময়ে। আজ মুসলিম বিশ্ব এবং আরব বিশ্বের পূর্বের চেয়ে অধিক এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন যে, শুধু স্লোগান দেওয়া এবং মিটিং করার মাধ্যমে কাজ হবে না, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তুর্কি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও পক্ষপাতিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে তাদের অন্তরে, অর্থাৎ ইসলামবিরোধী লোকদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে এতটা কুধারণা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে তারা ইসলামকে একটি সাধারণ ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে না, বরং এমন একটি শিক্ষা মনে করে যা মানুষকে মানবতা থেকে বের করে পশুতে, বরং হিংস্র পশুতে পরিণত করে।

ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মগুলো থেকে তারা পালায় না, যদিও সেগুলোকে ঘৃণার যোগ্য মনে করে; কিন্তু ইসলামকে তারা ভয় পায়। অর্থাৎ যারা ইসলাম বিরোধী, তারা এর

অগ্রগতিকে সভ্যতা-ভব্যতার পথে শুধু বাধা হিসেবেই মনে করে না, বরং স্বয়ং মানবতার জন্যই এটিকে ধ্বংসাত্মক বলে বিশ্বাস করে। আর আজকাল তো এর ওপর পূর্বের চেয়েও অধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি দেশে যারা ডানপন্থি বা তাদের সমমনা– তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো অভিযান চালাচ্ছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য তিনি (রা.) এই পথনির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, মুসলমানদের উচিত নিজেদের ভুল থেকে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোযোগী হওয়া এবং ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করা, এর বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অন্যদের সচেতন করা, যেন সেই কষ্ট ও পশ্চাৎপদতা দূর হয়– মুসলমানরা যার সম্মুখীন। যদি ধর্মের জন্য তারা তবলীগ না করে, যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীনে তারা এই অতুলনীয় শিক্ষাকে জগদ্‌বাসীর সামনে উপস্থাপন না করে; [বাস্তবে তো এটিই হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলামকে তারা কখনো উপস্থাপন করে নি;] তাহলে এখন অন্ততপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হলেও কিছুটা চেষ্টা করা উচিত। জীবিত থাকতে হলে তার জন্যই কিছু চেষ্টা করা উচিত। কারণ তাদের জীবন এবং ইসলামের তবলীগ দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অতএব, আজও মুসলমানদের এই নীতিই অবলম্বন করা প্রয়োজন, নতুবা ইসলামবিরোধী বিশ্ব মুসলমান দেশগুলোর জন্য জীবন ক্রমশ দুর্বিসহ করতে থাকবে এবং করছেও বটে। এরপর অল পার্টিজ কনফারেন্স (তথা 'সর্বদলীয় সম্মেলন')-এর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি **'এক নজরে সর্বদলীয় সম্মেলন' নামে** বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এই প্যাম্ফলেটটি হুযূর (রা.) অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্টিজ কনফারেন্সের বৈঠকে উপস্থাপন করার জন্য **১৯২৫** সালের **১৩ই** জুলাই লিখেছেন। সম্মেলনের আয়োজকদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম যেন সশরীরে এতে যোগদান করে নিজের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, আমি স্বয়ং এতে যোগদান করতে অপারগ, কিন্তু আমার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমার মতামত বা পরামর্শ উপস্থাপন করছি। এই প্যাম্ফলেটে হুযূর (রা.) সর্বপ্রথম ইসলামের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংজ্ঞা বর্ণনা করেন আর বলেন, ইসলামের একটি ধর্মীয় সংজ্ঞা আছে যা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুযায়ী সংজ্ঞায়িত করার অধিকার রাখেন। দ্বিতীয়টি হলো ইসলামের রাজনৈতিক সংজ্ঞা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারা মুসলমান– এর উত্তর কেবল সেসব হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং শিখই দিতে পারবে যাদের সাথে মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এক দলের অনুসারী, যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে এবং মনে করে, তাদেরকে অন্য ফিরকার লোকেরা অমুসলমান মনে করলেও রাজনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে হিন্দু ও শিখরা যখন তাদের সাথে লেনদেন করবে তখন তাদের সাথে একই রকম ব্যবহার করবে। আর তারা একদলের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, অন্য দলের বিরুদ্ধেও তা-ই করবে। প্রত্যেক ফিরকাকে তারা মুসলমান জ্ঞান করেই তাদের সাথে ব্যবহার করবে। অতএব, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের স্বার্থ এক। কিন্তু মুসলমানরা এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন না করলে অন্যরা এক এক করে তাদেরকে গ্রাস করবে আর তাদের চৈতন্যোদয় তখন গিয়ে হবে যখন চৈতন্যোদয়ে আর কোনো লাভ হবে না। তাই হুযূর (রা.) সকল মুসলমান ফিরকার সামনে এই অমূল্য নীতি উপস্থাপন করেন যে, রাজনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে পূর্ণ ঐক্য এবং সংহতি থাকা উচিত। কেননা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি যদি কোনো জাতি বা দলকে পৃথক করে দেন তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে, তারা অন্য জাতির প্রতি ঝুঁকে পড়বে না? এরপর তিনি (রা.) ইসলামের উন্নতি ও প্রসার এবং এর রাজনৈতিক

দৃঢ়তার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব দেন এবং বলেন, ইসলামের দৃঢ়তার জন্য আবশ্যক হলো, গোটা ভারতে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তবলীগি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা এবং তবলীগি সংগঠনগুলোর (মাঝে) পারস্পরিক ঐক্য গড়ার কোনো উপায় খুঁজে বের করা। কেননা ইসলামের জীবন তবলীগের ওপরই নির্ভরশীল আর এজন্য একটি পূর্ণাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা আবশ্যক। [আর এখন তো একাজের ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বজুড়ে।] অধিকন্তু মুসলমানদের শিল্প এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য রীতিমতো (একটি করে) বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। প্রত্যেক বিভাগের একটি লক্ষ্য থাকবে আর বছর শেষে অবহিত করা হবে যে, (সেই) লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে। [আর এটি বড়ো বড়ো ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ।] এছাড়া অনতিবিলম্বে এমন একটি কমিটি গঠন করাও আবশ্যক যারা এ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে যে, মুসলমানদেরকে অন্যান্য জাতির প্রভাব থেকে কীভাবে মুক্ত করা যায় আর জীবনের এমন কোন কোন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে দক্ষ মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। অতঃপর সেই কমিটির এই ঘাটতি পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, সুদবিহীন কোনো উপায় বের করা যদি সম্ভব হয়, আর তা বের করা সম্ভবও বটে, তাহলে আমাদের জামা'তও এতে যুক্ত হতে প্রস্তুত আছে। আর তিনি (রা.) বায়তুল মাল এবং মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠার বিষয়েও প্রস্তাব দেন। অধিকন্তু যেখানে অমুসলিম সরকার শাসন করছে, ফৌজদারী মামলা ছাড়া মুসলমানদের অন্যান্য ঝগড়া-বিবাদ আদালত পর্যন্ত টেনে নেবার পরিবর্তে পরস্পর মিলেমিশে মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েত প্রথা চালু করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি (রা.) বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হলো, পরস্পরের ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করা। উদার মনোভাব নিয়ে অন্যদেরকে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে দিন এবং স্বয়ং নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করুন। হুযূর (রা.) ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ও কারিগরি (পেশা) সম্পর্কে বলেন, ব্যাবসা-বাণিজ্য এমন একটি ক্ষেত্র যে বিষয়ে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি অবহেলা করেছে। আর ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের দাসে পরিণত হয়েছে। [এটি সেই যুগেও ছিল এবং এখন তো আরো স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীর যেসব বড়ো বড়ো ধনাঢ্য ব্যক্তি বা সংস্থা রয়েছে, ব্যাবসায়ী রয়েছে– তারা ইহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অন্য যে–কোনো ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন– (মুসলমান) তাদের দাস হয়ে রয়েছে। তখনো একই অবস্থা বিরাজ করছিল। বর্তমানে এক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবং ব্যাবসায়ীদের দাসে পরিণত হচ্ছি।] যেমনটি আমি বলেছি, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তাই এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতির জন্যও বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। পরিশেষে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমি আবারও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য বা প্রবন্ধ শেষ করছি– আমাদের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হবে এবং সকল পরিকল্পনা নিষ্ফল হবে, যদি এ বিষয়টি আমরা খুব ভালোভাবে অনুধাবন না করি যে, আমরা একে অপরকে কাফির বললেও অন্যদের দৃষ্টিতে আমরা (সবাই) মুসলমান। আর একের ক্ষতি মানেই অন্যের ক্ষতি। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় ফতওয়াগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত। কেননা, এগুলো তাদের কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে। ইসলাম কখনো বলে না, তোমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তোমরা তাদের

সাথে মিলে কাজ করতে পারবে না যাদেরকে তোমরা মুসলমান বলে মনে করো না। মহানবী (সা.) যদি পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাথে সমঝোতা করতে পারেন, তাহলে মুসলমান হবার দাবিদার ফিরকাগুলো ইসলামের রাজনৈতিক অগ্রগতি– বরং বলা যায়, রাজনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে না কেন? আমরা যদি এই সময়ে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি, তাহলে নিশ্চিতরূপে এটিই প্রমাণিত হবে যে, আমাদের বিরোধ ইসলামের জন্য নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থে এবং নিজ কামনাবাসনার জন্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দুর্ভাগ্য হতে নিরাপদ রাখুন।

পাকিস্তান ও কতিপয় মুসলমান রাষ্ট্রের সার্বিক চিত্র এটিই। বিশেষ করে আহমদীদের বেলায় তাদের মনোভাব হলো, এরা কাফির। এমনিতে তো প্রত্যেক ফিরকাই একে অপরকে কাফির বলে থাকে। আর এ কারণেই অমুসলিম বিশ্বে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে আর তারা মুসলমানদের ক্ষতি করছে। কাজেই, আজও অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ও মুসলমানদের এ বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(পাক-ভারত বিভক্ত হবার সময়ে,) ভারতের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিল যাদের কাজ ছিল, প্রতি দশ বছর পর পর পর্যালোচনা করে দেখা যে, এখানকার জনগণকে পৃথক সরকার গঠনের বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতটুকু অধিকার দেওয়া যেতে পারে। এ কমিশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার, যার নাম ছিল স্যার জন সাইমন। যাহোক, এই কমিশন এবং এর সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে নিজের বিস্তারিত মতামত দিয়েছেন এবং মুসলমানদের পথনির্দেশনাও দিয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের ইতিহাসে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র বরাতে এর বিশদ বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃটিশ সরকারের গঠিত কমিশনের প্রতিবেদন ভারতীয় জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাই তারা সেটি গ্রহণ করে নি। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ হতে গোল টেবিল সম্মেলনের আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়, যেন বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিরা একস্থানে একত্রিত হয়ে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে।

এহেন পরিস্থিতিতে হুযূর (রা.) মুসলমানদের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য দ্রুত এই প্রবন্ধটি লেখেন আর তাদেরকে এ মর্মে নসীহত করেন, তারা যেন পারস্পরিক বিভেদ ও মতবিরোধ পরিত্যাগ করে জাতির কল্যাণার্থে একতা ও সংহতি বজায় রেখে কাজ করে। একমাত্র এ পদ্ধতি অবলম্বন করলেই তারা বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করে নিজেদের অধিকার আদায়ে সফল হতে পারবে। কনফারেন্সে তাদের এমন প্রতিনিধি যাওয়া উচিত যারা জাতির প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। হুযূর (রা.) এ পর্যায়ে সরকার পক্ষকেও পরামর্শ প্রদান করেন যেন তারা রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ নিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাহলে কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত মানুষ খুশিমনে মেনে নেবে। মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে হুযূর (রা.) বলেন, আমার দৃষ্টিতে 'অল মুসলিম পার্টিজ'-এর কনফারেন্সের জন্য কাজ করার সময় এসে গেছে। কেবল এটি ছেপে দেওয়াই যথেষ্ট নয় যে, এগুলো হলো মুসলমানদের দাবি। এমন লোক যদি গোলটেবিল বৈঠকে বসে যারা এসব দাবিকে উপেক্ষা করবে, সেক্ষেত্রে কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের কোনো মূল্যই আর থাকে না। অতএব এখনই

সময়– প্রথমত, তারা সরকারকে ভুল নির্বাচনের ক্ষতিকর ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করবে এবং দ্বিতীয়ত, জনগণকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করবে; আর তাদের ততক্ষণ স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া উচিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে না হবে। আর সে সময়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই পরামর্শ অনেক স্থানে গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছিল।

অতঃপর ভারতবর্ষে সে সময়ে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তার সমাধানের বিষয়ে তিনি (রা.) প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রবন্ধে সে সময়ে বিরাজমান পরিস্থিতির সমাধান উল্লেখ করেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ছাপার কিছুকাল পর যুক্তরাজ্য সরকার লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে, যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে ভবিষৎ কর্মপদ্ধতি প্রস্তাব করা যায়। সাইমন কমিশন যেহেতু মুসলমানদের অধিকারের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি, তাই হুযূরের দুশ্চিন্তা ছিল এবং তিনি চাইতেন, ভবিষ্যতে যেন মুসলমানদের অধিকার উপেক্ষা করা না হয়। এ কারণে হুযূর (রা.) এহেন পরিস্থিতিতে সমীচীন মনে করলেন, সাইমন কমিশন রিপোর্টের ওপর পর্যালোচনা করে এর ত্রুটিসমূহ যেন চিি্নত করা যায় এবং ভারতবর্ষের সমস্যাবলির এমন সমাধান উপস্থাপন করা যায়, যার ফলে ভবিষ্যতে সকল জাতি সন্ধি ও মৈত্রির সাথে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। যেমন তিনি (রা.) বলেন,

আমি মনে করি, একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হবার কারণে দেশের রাজনীতির সাথে আমার ততটা সম্পৃক্ততা নেই যতটা সেসব লোকের রয়েছে যারা দিনরাত এ কাজেই নিবেদিত থাকে। কিন্তু সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের বিষয়ে আমার দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশি। এছাড়া এ জগতের হট্টগোল থেকে পৃথক হবার কারণে সম্ভবত কিছু বিষয়ের গভীরে সেসব মানুষের তুলনায় সহজে অবগাহন করতে পারি, যারা কোনো না কোনো দলের পক্ষ থেকে এ যুদ্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং এখন যেহেতু গোলটেবিল বৈঠকের ঘোষণা দেবার কারণে মানুষের চিন্তাচেতনা ভারতবর্ষের সমস্যাবলির সমাধানের দিকে ধাবিত হয়ে আছে, [এটি সে যুগে অনেক বড়ো একটি বিষয় ছিল;] তাই আমি এটাই সমীচীন মনে করছি যে, আমার চিন্তাধারা আমি উভয় দেশের বিদ্বেষমুক্ত মানুষের সামনে উপস্থাপন করি। হুযূর (রা.) তাঁর পর্যালোচনার মাঝে মুসলমানদের অধিকারসমূহ এবং দাবিদাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এর যৌক্তিকতা স্পষ্ট করেন। একইসাথে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলির বিষয়ে ক্ষুরধার যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী সমাধান উপস্থাপন করেন। এই সর্বাঙ্গীণপসম্পূর্ণ রচনার ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশের জন্য তৎক্ষণাৎ পৌঁছানো হয় যেন গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা এটি পড়ে উপকৃত হতে পারে। মুসলমান প্রতিনিধিরা এদ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। আর তারা প্রথমবারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে সফলতার সাথে তাদের দাবিসমূহ কনফারেন্সে উপস্থাপন করে। সেই যুগে অনেক উপকার হয়েছে। ইংল্যান্ডের নীতিনির্ধারক ব্যক্তিদের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে এবং তারা ভারতে মুসলমানদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাদের দাবিসমূহের যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

হুযূর (রা.)-র এই পুস্তক ভারত ও ইংল্যান্ড উভয় স্থানেই সমাদৃত হয় এবং তা অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করা হয়। আর কতক চিন্তাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও

সাংবাদিক অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাষায় হুযূরকে সাধুবাদ জানান। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এরূপ বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যেভাবে আমি বলেছি, এই পর্যালোচনা উভয় স্থানেই পরম গ্রহণীয়তা পায় এবং গুরুত্ব সহকারে পড়া হয়। এখন এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

উত্তর প্রদেশের সাবেক গভর্নর লর্ড মেস্টন বলেন, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনি আহমদীয়া জামা'তের ইমাম সাহেবের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পুস্তক আমার নিকট প্রেরণ করেছেন। [এটি প্রেরণকারীকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন।] এর পূর্বেও আমি তাঁর কয়েকটি রচনা আগ্রহভরে পাঠ করেছি। আমি আশা করি, এই পুস্তকটি পড়েও আমি আনন্দিত ও উপকৃত হবো।

সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট কমান্ডার কেনওয়ার্দি বলেন, 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান' শীর্ষক পুস্তক প্রেরণের জন্য আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। আমি এটি গভীর আগ্রহের সাথে পড়েছি।

উত্তর প্রদেশের গভর্নর এবং পাঞ্জাবের সাবেক গভর্নর স্যার ম্যালকম হেইলি লন্ডন মসজিদের ইমাম সাহেবকে লেখেন, এই পুস্তকের জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যা আপনি আহমদীয়া জামা'তের ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে আমার নামে প্রেরণ করেছেন। আমি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং এই স্পৃহাকে খুব ভালোভাবে বুঝি আর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি– যাতে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলির সমাধান নিয়ে কাজ করছেন। আমি বিশ্বাস করি, এই পুস্তক আমার উপকারে আসবে এবং আমি এটি অত্যন্ত আগ্রহভরে পাঠ করব।

এরপর স্যার জন ও. মিলার বলেন, এই পুস্তিকাটি প্রেরণের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি– যেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সাইমন কমিশনের প্রস্তাবনার ওপর এটিই একমাত্র বিশদ সমালোচনা যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমি এসব ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করব না, যেগুলোর বিষয়ে মতভিন্নতা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের মহামান্য ইমাম যে আন্তরিকতা, যৌক্তিকতা ও স্পষ্টতার সাথে তাঁর জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন, আমি তার প্রশংসা করি এবং আমি মহামান্য হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন সাহেবের উন্নত চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

এরপর শ্রদ্ধেয় পিটারসন সি.এস.আই.সি.আই.আই.ই বলেন, 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান' শীর্ষক পুস্তক প্রেরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি এখন পর্যন্ত পুস্তকটি পাঠ করে শেষ করতে পারি নি। আশা করছি, কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলব। কিন্তু যতটুকুই আমি পড়েছি তা দ্বারা নিঃসন্দেহে এটিই প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকটি বর্তমান সমস্যাবলি বুঝানোর জন্য একটি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এতে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর প্রেরণকারীকে লিখছেন, আশা করি, আমি সাক্ষাৎ করব।

আলী গড়ের ডাক্তার জিয়া উদ্দিন সাহেব বলেন, "আমি তার পুস্তক অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ইউরোপে এটি ব্যাপকহারে প্রচার করুন। প্রত্যেক সাংসদকে অবশ্যই এর একটি করে কপি প্রেরণ করা হোক এবং ইংল্যান্ডের সকল সংবাদপত্রের সম্পাদককে এক কপি করে যেন প্রেরণ করা হয়। ভারতবর্ষের তুলনায় এ পুস্তকটি ইংল্যান্ডে অধিক পরিমাণে প্রচার করা দরকার। তিনি ইসলামের এক বিশেষ সেবা

করেছেন।" এখানে এই অ-আহমদী লিখছেন, তিনি ইসলামের সেবা করেছেন; আর এখন অ-আহমদীরা বলে, আহমদীরা অমুসলিম।

করাচির এমএলএ শেঠ হাজী আব্দুল্লাহ্ হারুন সাহেব বলেন, আমার মতে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত যে পরিমাণ পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে সেসবের মাঝে 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান' পুস্তকটি শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলোর একটি।

আল্লামা ডাক্তার স্যার মুহাম্মদ ইকবাল লিখেছেন, আমি এই পুস্তিকার কয়েকটি জায়গা পড়েছি। এটি চমৎকার এবং সর্বাঙ্গীণসম্পূর্ণ পর্যালোচনা।

লাহোরের ইনকিলাব পত্রিকা লিখেছে, মির্যা সাহেব এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলমানদের অনেক বড়ো সেবা করেছেন। মির্যা সাহেব সেই কাজ সম্পাদন করেছেন যা বড়ো বড়ো ইসলামি ফিরকাগুলোর করা উচিত ছিল।

লাহোরের 'সিয়াসাত' পত্রিকা লিখেছে, ধর্মীয় মতানৈক্যের বিষয়টিকে এক পাশে রেখে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখা যায়, মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব সাহিত্যের জগতে যে কাজ করেছেন তা ব্যাপকতা ও কল্যাণপ্রসারের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য এবং রাজনীতিতে তার জামা'তকে সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি চালানোর ক্ষেত্রে তিনি যেই কর্মপন্থার সূচনা করে নিজ নেতৃত্বে সেটিকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন– তা প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম এবং সত্যচেতা ব্যক্তির প্রশংসা আদায় করে ছাড়ে। গোটা একটি প্রজন্ম তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাক্ষী। আর নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা, সাইমন কমিশনের সামনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা, সমসাময়িক বিষয়গুলোর ওপর ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যবহুল বক্তৃতা প্রদান এবং মুসলমানদের অধিকারের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণে পরিপূর্ণ পুস্তকাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আলোচিত পুস্তক সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে ইংরেজিতে প্রকাশিত তাঁর যে বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা রয়েছে তা অধ্যয়নে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুধাবন করা যায়। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি পরিশীলিত ও মানুষকে মুগ্ধ করার মতো আর তাঁর ভাষা সহজবোধ্য। এগুলো ছিল কিছু পর্যালোচনা।

অতঃপর বিশ্বের বর্তমান অস্থিরতার বিষয়ে ইসলাম কী সমাধান প্রদান করে– এ সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। বিশ্বশান্তি সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তৃতা করেছেন, সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিশ্বশান্তির বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে ৯ অক্টোবর ১৯৪৬ সালে বিকাল ০৫:৩০ মিনিটে দিল্লির আর্ট পার্ক রোডে এক বিশাল প্রাঙ্গণে এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ বক্তব্য শোনার জন্য কয়েক শত অ-আহমদী এবং অ-মুসলিম সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা খুব মনোযোগ সহকারে এবং শান্তভাবে হুযূরের বক্তৃতা শুনেছেন। প্রথমবার এটি ১৫ এপ্রিল ১৯৬১ সালে আল-ফযলে ছাপা হয়েছিল। যাহোক, এ বক্তৃতা সম্পর্কে দিল্লির 'তেজ' পত্রিকা ১৪ অক্টোবর ১৯৪৬ সালের প্রকাশনায় নিম্নলিখিত নোট ছাপে:

"আহমদীদের ইমাম হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) এক বক্তৃতায় বলেন, শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি মানব সভ্যতার ন্যায় প্রাচীন বিষয়। কেননা মানবপ্রকৃতির সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় তবে এ লক্ষ্যে প্রতিহিংসা ও ঘৃণা দূর করতে হবে। বিষয়টি রাজনৈতিক নয় বরং বিষয়টি নৈতিক; আর আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকি আর (জাগতিক) রুটির

মোহ এবং লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগ করি, তবে এরপরে আমাদের মাঝে ঘৃণা ও লোভলালসার পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব আর প্রেমময় আবেগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

ধর্মজগতের মতবিরোধের পরিসমাপ্তি সম্ভব। শর্ত হলো, আমরা যেন পরস্পরের আবেগকে সম্মান করা শিখি। ধর্মজগতের মতানৈক্য শেষ করা সম্ভব; তবে শর্ত হলো, আমরা যেন একে অপরের আবেগকে সম্মান করতে শিখি আর নিজেদের মাঝে সহনশীলতা সৃষ্টি করি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অনুরূপভাবে জাগতিক ক্ষেত্রেও তা আবশ্যক। মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টিয় যুগেও এটি ব্যাপক ছিল। তিনি (রা.) বলেন, জাতপাত, ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি মতবিরোধ ঘুচিয়ে বিশ্বসম্প্রীতির চেতনা সৃষ্টি করা উচিত।

আমাদের দায়িত্ব হলো, নির্যাতিত-নিপীড়িত জাতিসমূহকে সাহায্য করা; তারা আমাদেরকে মারুক, কাটুক, যা-ই করুক না কেন! এ বিষয়ে তিনি (রা.) একটি প্রবন্ধ রচনা করেন; দিল্লির একটি পত্রিকার আপত্তির প্রেক্ষিতে তিনি এটি রচনা করেন। সেই পত্রিকা লিখেছিল, আহমদীরা পাকিস্তানের সমর্থন করছে, অথচ তাদের সাথে অন্যান্য মুসলমানরা ভালো ব্যবহার করে নি। [তারা আহমদীদের উসকানি দেবার চেষ্টা করছিল, কেননা আহমদীরা পাকিস্তানের সমর্থন করে অথচ (খোদ) মুসলমানরাই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না!] অতঃপর (পত্রিকাটি) লেখে, যখন পাকিস্তান গঠিত হবে তখন মুসলমানরা তাদের সাথে একই ব্যবহার করবে যা ইতিপূর্বে কাবুলে তাদের সাথে হয়েছিল আর তখন আহমদীরা বলবে, আমাদেরকে ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। [পত্রিকাটি এই মন্তব্য করে।]

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৬ মে ১৯৪৭ সালে মাগরিবের নামাযের পর এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা যেন অত্যাচারিত জাতিসমূহের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াই; প্রতিদানে তারা আমাদেরকে মারুক, কাটুক, (যা-ই করুক না কেন)। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমাদের শত্রুপক্ষ যদি আমাদের প্রতি অন্যায়, অবিচারও করে তবুও আমরা ন্যায়পরায়ণ থাকব। হুযূরের (রা.) এই ভাষণটি কাদিয়ানেও পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে। আজও কতক ব্যক্তি এ আপত্তি উত্থাপন করে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কেন পাকিস্তানে যোগ দেবার পক্ষপাতী ছিলেন? এ ভাষণটিই এসব কথার জবাব। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল আর জামা'ত সর্বদা মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ একথা অস্বীকার করেন নি যে, জামা'তের সাথে অন্যায় করা হবে না। তিনি (রা.) বলেন, যা কিছুই হোক না কেন, এখন মুসলমানদের সাহায্য করা আবশ্যক আর আহমদীদের তাদের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য, কেননা মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি (রা.) একটি বক্তৃতা করেন যার সারসংক্ষেপ হলো, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন যেখানে লাহোরের বড়ো বড়ো বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞজন ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন, আর তারা তাদের বক্তব্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রথম পাঁচটি বক্তৃতা লাহোরের মেনার্ড হলে ও ষষ্ঠ বক্তৃতাটি লাহোরের ইউনির্ভাসিটি হলে প্রদান করেন। তারা বলেন, লাহোরের মেনার্ড হলে ১৯৪৭ সালের ০৭ ডিসেম্বর তারিখে যে বক্তৃতা করেন আর সময়স্বল্পতার কারণে বিষয়বস্তুর কয়েকটি অংশ বর্ণনা বাকি ছিল। তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে তার স্মৃতি থেকে আল-ফযল পত্রিকায় প্রকাশ করিয়েছেন। পরবর্তীতে যা ০৯ ডিসেম্বর ১৯৪৭ লাহোরে প্রকাশিত দৈনিক আল-ফযল পত্রিকায় প্রকাশ পায়।হুযূর নিজের এই বক্তৃতায় বনসম্পদ, কৃষি, পশু এবং খনিজ

সম্পদের দিক থেকে পাকিস্তানকে কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে তার স্বর্ণালী নীতিসমূহ বর্ণনা করেন। বিভিন্ন প্রস্তাবনা দেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। এই বক্তৃতাটি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইসলামী মৌলিক আইন বিষয়ে তিনি নিজের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ করেন। কাদিয়ান থেকে লাহোর হিজরতের পর 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন এই বক্তৃতাটি সেসব বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতা, যা হুযূর (রা.) লাহোরের ইউনিভার্সিটি হলে প্রদান করেছিলেন। যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামী সংবিধান' অথবা 'ইসলামী মৌলিক আইন' । এই বক্তৃতাটি সে সময় জনসাধারণের উপকারার্থে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে একটি প্রচারপত্র আকারে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে আনওয়ারুল উলুমের ঊনবিংশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এই বক্তৃতায় হুযূর (রা.) ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিষয়ে আলোকপাত করেন যে, পাকিস্তানে কোন ধরনের সংবিধান অথবা আইন কার্যকর হওয়া উচিত। তিনি (রা.) বলেন, যদি পাকিস্তানের সংবিধানে জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য এই আইন পাশ করা হয় যে, পাকিস্তানের সীমানায় মুসলমানদের জন্য কুরআন ও সুন্নত অনুযায়ী আইন বানানো হবে, এর বিরোধী কোনো আইন বানানো বৈধ হবে না– তাহলে যদিও সরকারের ভিত্তি পুরোপুরি ইসলামী হবে না, কেননা সেটা হওয়া সম্ভন নয়; কিন্তু সরকার পরিচালনার পদ্ধতি ইসলামী হয়ে যাবে। আর মুসলমানদের জন্য এর বিধানও ইসলামী হবে এবং এটিই ইসলামের দাবি। ইসলাম কখনোই বলে না, হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের দ্বারাও ইসলামের বিধিবিধান পালন করাতে হবে। বরং এটি (ইসলাম) এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি তো সবাইকে স্বাধীনতা দেয়– প্রত্যেক ধর্মকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে। আজ তারা বলে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও বিধান চলবে। কিন্তু বাস্তবে এর সূচনা ও পরামর্শ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দিয়েছিলেন। এখন ইসলামের নামে আমাদের ওপর তারা অত্যাচার করছে। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনা এবং আইন বানানোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। যদি আহমদীরা এতটাই ইসলামের বিরোধী হয়ে থাকে যেমনটি বর্তমান যুগের মোল্লারা বলে, তাহলে এই পরামর্শ ও মনোযোগ আকর্ষণের তার কী প্রয়োজন ছিল? যাহোক, বর্তমানে দেশকে নামসর্বস্ব মোল্লারা জিম্মি করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি সৃষ্টি করুন যিনি তাদের ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে মুক্তি দেবেন এবং দেশ উন্নতির পথে ধাবমান হবে।

এরপর একটি বিষয় হচ্ছে 'পাকিস্তান সেই ইসলামী ভবনের একটি ইট যা আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করব'। এই বক্তৃতাটি তিনি (রা.) কোয়েটার টাউন হলে প্রদান করেছিলেন। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পাকিস্তান গঠনের অব্যবহিত পরেই 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে লাহোরে ছয়টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরে হুযূর (রা.) পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরে যান এবং পাকিস্তানের হাজার হাজার বাসিন্দাদের 'পাকিস্তানের দৃঢ়তা' বিষয়ে নিজের দৃষ্টি-উন্মোচনকারী ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনা দ্বারা আলোকিত করেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে হুযূর কোয়েটায় গমন করেন এবং কোয়েটায় অত্যন্ত তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা প্রদান করেন যাতে তিনি পাকিস্তানের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সমস্যাবলির প্রতি পাকিস্তানের অধিবাসীদের দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে সবিস্তারে তাদেরকে নিজেদের জাতীয় ও ধর্মীয় দায়িত্বাবলি সম্পাদন করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। নিজের জোরালো ও ভালোবাসায় পূর্ণ বাক্যাবলিতে সীমাহীন

ঈমানী শক্তি ও অদম্য উদ্দীপনা, দৃঢ়তা ও অবিচলতা দ্বারা লক্ষ লক্ষ মনোবলহীন ও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে নবজীবন ও আশার এক প্রেরণা সঞ্চার করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ৪ঠা জুলাই ১৯৪৮ সালে কোয়েটার টাউন হলে 'পাকিস্তান ও এর ভবিষ্যৎ' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এটি আল-ফযলে ১৯৫২ সালের মার্চে প্রকাশিত হয় এবং জনসাধারণের ওপর এর অনেক প্রভাব পড়ে।

১১ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে আহমদীয়া জামা'ত সারগোধা কোম্পানীবাগে 'পাকিস্তানের উন্নতি ও এ দেশের স্থিতিশীলতা' বিষয়ে মূল্যবান উপদেশমালা সম্বলিত একটি উন্মুক্ত জলসার আয়োজন করে। সে যুগে তো জলসা করা যেত। বর্তমানে তো আমরা তরবিয়তী জলসাও করতে পারি না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জলসাটির একটি অনন্য বিশেষত্ব ছিল যে, এতে প্রথমবারের মতো সারগোধা ও আশেপাশের অঞ্চলের সেসব হাজার হাজার আহমদী ও অ-আহমদী যারা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন– হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাদেরকে নিজ মূল্যবান উপদেশ ও দিকনির্দেশনাসমূহ দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ করে দেন। তাদের ইসলামী আদেশসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও পাকিস্তানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার প্রতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় মনোযোগ আকর্ষণ করেন। হুযূরের বক্তব্য শুরু থেকে শেষ অবধি গভীর আগ্রহ, নিমগ্নতা ও মনোযোগের সাথে শোনা হয়।

হুযূর (রা.) পাকিস্তানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন:

আমরা নিজেরা বলেছিলাম, হে খোদা! আমাদের এ দেশ দান করো। এখন এ দেশকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও একে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। যদি আমরা আমাদের দায়িত্বসমূহ অনুধাবন না করি তবে আমরা ইহকাল ও পরকালেও লজ্জিত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলবেন, আমি তোমাদের দাবি অনুযায়ী তোমাদেরকে এ দেশ প্রদান করেছি, কিন্তু তোমরা একে ধ্বংস করে ফেলেছ! [বর্তমানে মৌলভীরাই এ দেশকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।] পাকিস্তানের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সকল শ্রেণীর লোকদের সততার সাথে নিজেদের কর প্রদান করতে এবং পাকিস্তানের সুরক্ষাকল্পে বেশি বেশি যুবকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার জন্য তাগাদা দিয়েছেন। সে দিনগুলোতে পত্রিকাসমূহে এ বিতর্ক চলছিল যে, পাকিস্তান সরকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছুই করছে না। আমরা তো পাকিস্তানকে ইসলামের স্বার্থে চেয়েছিলাম। (তিনি) এ বিষয়ে তিনি দৃষ্টিউন্মোচনকারী নির্দেশাবলি প্রদান করেছেন ও পরিশেষে উপদেশ প্রদানপূর্বক বলেন, শুধুমাত্র স্লোগান দেওয়া কোনো জাতির সফলতার চিহ্ন হতে পারে না। যদি এখন সবাই সমস্বরে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে ব্যস্ত হয়ে যায়; যদি এখন সকলে সমস্বরে এটি বলতে থাকে, 'পাকিস্তান চিরজীবি হোক! হিন্দুস্তান ধ্বংস হোক!'– তবে হিন্দুস্তানের একটি ইঁদুরও মরবে না। [শুধুমাত্র স্লোগানের ফলে তো কেউ মরবে না।] কিন্তু আমি এতক্ষণ যা বললাম, বক্তব্যে যা উল্লেখ করলাম, সবাই যদি সেগুলো পালন করতে আরম্ভ করে– ব্যবসায়ীরা যদি আয়কর পরিশোধ করে, জনগণ যদি বিনা টিকেটে রেলে ভ্রমণ না করে, যুবকরা যদি অহেতুক কাজে নিজেদের সময় অপচয় করার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষিত হয় এবং শক্তসমর্থ যুবকরা যদি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, কর্মকর্তারা যদি ঘুষ খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত কাজ সততা ও পরিশ্রমের সাথে করে– তাহলে পাকিস্তান কার্যত শক্তিশালী হতে থাকবে। [কিন্তু বর্তমানে পূর্বের থেকে অনেক বেশি এর বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে।] এরপর তিনি বলেন, এরপর যদি আপনারা একবারও 'পাকিস্তান চিরজীবি হোক' না বলেন তবুও কার্যত

পাকিস্তানে উন্নতি হবে। স্লোগান দাও কিংবা না দাও– পাকিস্তানের চিরজীবি হবার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে।

যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত অনেক বিষয়াদিও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'রাশিয়া ও সাম্প্রতিক যুদ্ধ' সম্পর্কিত বিষয়টি আমি বেছে নিয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডে রাশিয়ার আগ্রাসন সম্পর্কে তার অভিমত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ প্রবন্ধটি লিখেন। ১৯৩৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর দৈনিক আল-ফযলে এটি প্রকাশিত হয়। হুযূর এ প্রবন্ধে রাশিয়ার পোল্যান্ড আক্রমণের কারণ ও উদ্দেশ্যসমূহের কথা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেন, রাশিয়া পোল্যান্ডকে বিভক্ত করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য ভালো মনে হচ্ছে না। তারা জার্মানির সাথে জোট বেঁধেছে এবং নিজ সেনাবাহিনীকে পোল্যান্ডে প্রেরণে হঠকারিতা দেখাচ্ছে, যেন জার্মানি সহজে পোল্যান্ড দখল করতে পারে এবং বিনা রক্তপাতে পোল্যান্ডের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। আর যদি এভাবে সফলতা অর্জন না হয় তাহলে এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি পোল্যান্ডের ওপর আক্রমণ করে বসবে। আর অন্যান্য দেশ যদি এতে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় জার্মানি পোল্যান্ডকে ধ্বংস করে দেবে এবং উভয় দেশ একে ভাগাভাগি করে নেবে। এ প্রবন্ধে হুযূর যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। হুযূর দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে মিত্রশক্তিকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন যা অত্যন্ত চমৎকার পরামর্শ ছিল। যাহোক, পোল্যান্ড বেঁচে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপরও তার গভীর দৃষ্টি ছিল; যেভাবে আমি বলেছি, এ বিষয়ে তার আরো প্রবন্ধ রয়েছে।

যেমনটি আমি বলেছি, তার ধর্মীয় সাহিত্য, তফসীর ইত্যাদি বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান রয়েছে। তার জুমআর খুতবা, জামা'তের বিভিন্ন জলসায় এবং অন্যান্য সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ আমাদের জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। তফসীরে কবীর আগে ১০ খণ্ডে ছিল; তার নোটের আলোকে এখন এতে আরো কিছু যুক্ত করা হয়েছে যা নতুনভাবে ১৫ খণ্ডে ছাপা হয়েছে। এতে আরো অনেক বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো কিছু সূরার ওপর তার নোট পাওয়া গিয়েছে, এগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সম্ভবত যখন এগুলো ছাপা হবে তখন এটি ৩০ খণ্ড আকারে সামনে আসবে। কেননা এগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভবিষ্যদ্বাণীতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের জীবনে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। আমি কয়েকটি উদাহরণ আপনাদের সামনে এখনই উপস্থাপন করলাম। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এই ভাণ্ডার, এই রচনাবলি আমাদের পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত। অনেক এমন কথা আছে যা বর্তমান যুগের জন্য খুবই উপযোগী। এর থেকে আমাদের লাভবান হতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)